৮

বাংলাদেশে প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে পেশকৃত কয়েকটি কথা

(বি.ডি.আই. এর সচীব ও কোষাধ্যক্ষ ডক্টর আশরাফ আলী এ বছরের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশে প্রকৌশলীদের সামনে পেশ করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বক্তব্যটি তৈরী করেন।)

প্রিয় প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের সাথে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্য ইনস্‌টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স এর বর্তমান সভাপতি প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে আমি আমার আপনজনদের কাছে ফিরে এসেছি। প্রথমতঃ আপনারা আমার স্বদেশবাসী। তারও উপরে, আপনারার আমার সমগোত্রীয়। আমরা সবাই প্রকোশলী। প্রশিক্ষণ ও চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে আমরা সবাই পরস্পরের কাছাকাছি। শেষ বিশ্লেষণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কিত ধারণাতেও আমাদের চিন্তাধারা পরস্পর-সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার কারণ হলো, দেশের ভাল-মন্দের সাথে প্রকৌশলীদের ভাল-মন্দ প্রত্যক্ষভাবে একই সূত্রে গাঁথা এ কথাটি আমাদের সবার মনের মধ্যে সব সময় কাজ করে চলেছে।

কয়েক বছর আগে আমরা কয়েকজন প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত আমেরিকাবাসী বাংলাদেশী মিলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি করে অবদান রাখা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। ফলে তৈরী হয় বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, বা সংক্ষেপে বি.ডি.আই.। বি.ডি.আই. মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে রেজিস্ট্রীকৃত একটি করমুক্ত, অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। বি.ডি.আই. এর কাজ হলো : উন্নয়ন বিষয়ে বাংলাদেশী পরিকল্পনাবিদদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং বাংলাদেশের জন্য সঠিক পন্থাটি বাস্তবায়িত করতে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এখন, আপনাদেরকে এ সব কথা বলছি কেন? প্রকৌশলী হিসেবে আপনারা হচ্ছেন উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বশেষ যোগসূত্র। আপনাদের হাত দিয়েই পরিকল্পনা বাস্তবতা লাভ করে।

ঐতিহ্যগতভাবে প্রকৌশলীরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ ঐতিহ্য শুধু এ দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই প্রকৌশলীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে একটু ঠান্ডা। তবে আজকে আমি যে বিষয়ে কথা বলবো তাতে আপনাদের আগ্রহ না দেখিয়ে উপায় নেই। গত এক যুগ আমি মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে বাস করছি। সেখানকার সিস্টেমগুলো কিভাবে কাজ করে সে ব্যাপারে আমার প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই আমার আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাস্ত্রকে শিল্পোন্নত দেশের দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করবো।

আমাদের প্রকৌশলীরা ব্যাচেলর্স ডিগ্রী করে মাসে গড়ে ৩০০০ থেকে ৫০০০ টাকা বেতন পায়। উল্টো দিকে, একজন ব্যাচেলর ডিগ্রীধারী মার্কিনী প্রকোশলী মাসে গড়ে প্রায় ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ বিশ হাজার টাকা বেতন পায়। সরকারকে আয়কর দেবার পর সে প্রায় আশি হাজার টাকা ঘরে আনতে পারে। তাতে বছরে সে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ঘরে আনে। এই রকম আয় দিয়ে একজন মার্কিনী ব্যাচেলর ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী, গাড়ী, ফ্রিজ, টেলিভিশন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ডিস ওয়াশার, ব্যক্তিগত কম্পিউটার, ইত্যাদি কিনতে পারে। আমাদের দেশের ব্যাচেলর ইঞ্জিনিয়ার তার গড় আয় দিয়ে হিসাব মতে তিন বেলা ভাতও জুটাতে পারবে না। বাড়ী-গাড়ী তো

দূরের কথা। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের দেশের প্রকৌশলীর সাথে মার্কিনী প্রকৌশলীর পার্থক্য আছে কিনা।

আমি বেশ কয়েকটি মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস দেখেছি। আমার দেখা মতে বুয়েট-এর সিলেবাস ভাল একটি মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের সমতূল্য। শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু প্রায় একই রকম। ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অংক, ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই সিলেবাস সমতূল্য। সুতরাং সিলেবাস দেখে পার্থক্য ধরা সম্ভব নয়। তবে কি কোন গুণগত পার্থক্য আছে? আপনাদের কাছে নিঃসংকোচে বলবো, মার্কিনী ইঞ্জিনিয়ার ও বাংলাদেশী তথা যে-কোন তৃতীয় বিশ্বের ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে সত্যিই গুণগত পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য কি এবং তার উৎপত্তি কোথায় এখন সে কথায় আসা যাক।

একজন মার্কিনী ছাত্র যখন প্রকৌশলী বিদ্যা পড়ে, তার মনে মূলতঃ দুটো জিনিস কাজ করে। এক নম্বর হলো : ভালভাবে পাশ করতে পারলে সে ১ লক্ষাধিক টাকা মাসিক বেতনের চাকরী পেতে পারে। আর দুই নম্বর হচ্ছে : ঐ চাকরী পাওয়ার জন্য এবং ঐ চাকরী সুষ্ঠুভাবে করার জন্য তাকে কমপক্ষে প্রকৌশল বিদ্যার মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে কেবল ব্যাচেলর নয়, প্রচুর সংখ্যায় মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রীধারী প্রকৌশলীও প্রতি বছর তৈরী হচ্ছে। তাদের ক্ষেত্রেও এই কথা দুটো প্রযোজ্য। এবং সহজেই বোঝা যায় এই কথা দুটি শুধু প্রকৌশল বিদ্যায় নয়, বরং যে-কোন বিষয়ের বেলায়ও সমানভাবে সত্যি। আসলে বলতে কি, এই বিষয় দুটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একভাবে বলতে গেলে এই বিষয় দুটি ভেঙে বলবার জন্যেই আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

তাহলে প্রথমে প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মচারী, অথবা এক কথায়, শ্রমিকদের বেতনের প্রশ্নে আসা যাক। এর দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ এবং অপরটি আন্তর্জাতিক। দেশের ভিতরে বেতন জিনিসটির প্রত্যক্ষ মানে কি? এর মানে হলো শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা। অর্থাৎ বেতন দিয়ে আপনি কি কি নিত্য ব্যবহার্য ও বিনোদনের সামগ্রী কিনতে পারেন। বাসস্থান, খাওয়া, পোশাক, ছেলেমেয়ের স্কুল, পরিবহন, ফ্রিজ, টেলিভিশন, ইত্যাদি। দেশের উৎপাদক শ্রেণী, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী - বুঝতেই পারছেন বৃহত্তর অর্থে আপনাদেরকেও শ্রমিক নামে অভিহিত করছি - অর্থনীতির সহজ সংজ্ঞা অনুসারে দেশের উৎপাদক শ্রেণী, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীই আবার সে দেশের মূল ক্রেতা ও ভোক্তা।

কথাটা গুরুত্ব দিয়ে বোঝা দরকার। অফিসে, কল-কারখানায় শ্রমিকরা গাড়ী, ফ্রিজ, ওষুধ, টেলিভিশন, ইত্যাদি উৎপাদন করে এবং ক্রেতা ও ভোক্তা হিসেবে তারা বাজার থেকে ঐ পণ্যগুলিই কেনে। বাস্তবে দেখা যায়, যে-সব দেশে শ্রমিকরা অফিসে, কারখানায় উচ্চ দামের পণ্য উৎপাদন করে, সে-সব দেশে সাধারণতঃ ঐ উচ্চ দামী পণ্য কেনার ক্ষমতাও শ্রমিকদের থাকে। অর্থাৎ শ্রমিকরা গড়ে যে-মূল্যের সম্পদ উৎপাদন করে, তার ক্রয়ক্ষমতাও সেই অনুপাতে হয়। তার মানে যে-সব দেশে শ্রমিকরা উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য উৎপাদন করে, সে-সব দেশের শ্রমিকরা উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য কেনার ক্ষমতাও রাখে।

এই তত্বের ছোট্ট একটা ব্যতিক্রম আছে, সেটা বলে রাখা নিরাপদ। মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী ধনী দেশগুলি সম্পর্কে তত্বটি প্রযোজ্য নয়। এই দেশগুলি স্বদেশে মূলতঃ কিছুই উৎপাদন করে না, তথাপি এসব দেশের নাগরিকদের ক্রয় ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে উঁচু। তবে এসব দেশ যদি শীঘ্রি স্বদেশে উৎপাদন শুরু না করে, তাহলে তেলের উপযোগীতা শেষ হলেই অথবা তেল ফুরিয়ে গেলেই এসব দেশ আগের মতো দরিদ্র হয়ে যেতে বাধ্য। যাহোক, এটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। আসলে তত্বটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই তত্বটিকে অর্থনীতিবিদরা অনেক সময় ‘‘আভ্যন্তরীণ বাজার উন্নয়ন’’ নামে অভিহিত করেন। স্বদেশে তৈরী পণ্যের চাহিদা দেশের

ভিতরে থাকতেই হবে। তার মানে দেশের শ্রমিকদের হাতে যথেষ্ঠ ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে। একজন শ্রমিক দিনে গড়ে যত টাকা মূল্যের সম্পদ উৎপাদন করে তা দিয়ে তার উৎপাদনশীলতা মাপা হয়। উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য উৎপাদন করলে দ্রুত অধিক পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুতরাং শ্রমিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর খাতিরেই উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য উৎপাদনে হাত দেওয়া উচিত এবং ব্যক্তি ও জাতির সম্মানের খাতিরে এবং বৃহত্তর জনগণের কল্যাণের খাতিরে শ্রমিকদের বেতন সমানুপাতিক হারে বেশী হওয়া উচিৎ।

এতে লাভ সব পক্ষের। সরকার অধিক পরিমানে রাজস্ব পাবেন; তাই সরকারী কর্মচারী ও আমলাদের বেতন বাড়বে এবং দেশের অবকাঠামো - নতুন নতুন রাস্তা, সেতু, ইত্যাদি - তৈরী হবে। কল-কারখানা ও ফার্মের মালিকরা তো লাভবান হবেনই। এবং আগেই বলেছি, এর ফলে লাভবান হবেন শ্রমিক ও সাধারণ জনগণ। মূলতঃ শ্রমিক সাধারণের কল্যাণই এই তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এটা গেলো শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ দিকটি। এরপর আসে এর আন্তর্জাতিক দিকটি।

যাতায়াতের সুবিধা হওয়ার কারণে পৃথিবীটা আজ সত্যিই ছোট হয়ে এসেছে। যাতায়াত বলতে শুধু মানুষের যাতায়াতই বোঝায় না। আধুনিক টেলি-যোগাযোগ, কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রোনিক প্রযুক্তির ফলে এখন বস্তা বস্তা তথ্য ও পুঁজি মিনিটে মিনিটে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাঠানো সম্ভব। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পরস্পর নির্ভরশীল ও আন্তঃসম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। বলা হোতো যে, আমরা সবাই একটিমাত্র বিশ্ব পল্লীতে বাস করি। এখন কথাটা সত্যিকার অর্থে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। ঠিক সেই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গড় জাতীয় মাথাপিছু আয়ের তারতম্য থাকলে তা এই সব দেশে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের মধ্যকার মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য হচ্ছে প্রায় ১০০ থেকে ১২০ গুণ। বাংলাদেশের উপর এর প্রতিক্রিয়া খুবই সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের বাছা বাছা ছাত্র মার্কিন যুক্তরাস্ট্র ও অন্যান্য অধিক বেতন প্রদানকারী দেশে চলে যাচ্ছে, আর ফেরৎ আসছে না। মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সিনেট মাঝেমধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় কোন্ দেশ থেকে কখন কি ধরণের ছাত্র ও পেশাজীবী আনতে হবে। মস্তিষ্ক পাচার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বাস্তব সত্যি ঘটনা। যেমন ধরুন, বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় ভারতের গড় মাথাপিছু আয় থেকে দশগুণ বাড়াতে পারলে ভারত থেকেও বাছা বাছা বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, চিন্তাবিদ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে নিয়ে আসা সম্ভব।

আয়ের আন্তর্জাতিক বৈষম্যের ফলে মস্তিষ্ক পাচার থেকেও মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে এবং ঘটে। সেটা কি? অধিকতর আয়-বিশিষ্ট জাতি খুব সহজে অল্পতর আয়-বিশিষ্ট জাতির সব রকম আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। সাধারণ জনগণের উপর এই প্রভাব এক রকম। মস্তিষ্ক পাচারের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের উপর এই প্রভাব আরেক রকম। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়ংকর ঘটনা হচ্ছে, আয়ের এই বৈষম্যের ফলে তৃতীয় বিশ্বের আমলাতন্ত্র, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, এমন কি আইন পর্যন্ত প্রতিরক্ষাহীন হতে বাধ্য। এর থেকে বেশী বলার প্রয়োজন নেই। আপনারা নিজেরা ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবেন।

মার্কিন ছাত্রের মনে দ্বিতীয় যে জিনিসটি কাজ করে তা হলো, চাকরীর বাজারে তাকে একটা চাকরী পেতে হবে এবং চাকরী সম্পর্কিত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হবে। কি কাজ তাকে করতে হবে আসুন তা মনে করার চেষ্টা করি। আপাততঃ সামরিক প্রয়োগের ব্যাপারটি ভুলে গিয়ে শুধু প্রকৌশলী উৎকর্ষের কথা ভাবা যাক। মার্কিনী প্রকৌশলীকে মটরগাড়ী, আকাশগামী উড়োজাহাজ, সমুদ্রগামী জাহাজ ও সাবমেরিন, মহাশূন্যগামী রকেট বানাতে হবে। টেলিভিশন, কম্পিউটার, টেলিফোন বানাতে হবে যা প্রায় কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে নষ্ট হয় না।

এখন তার সামনে চ্যালেঞ্জ হলো, কি করে মটরগাড়ীকে আকাশে উড়ানো যায়, কি করে বিমানের গতিতে ট্রেন চালানো যায়, কি করে উন্নত মানের হাঁস-মুরগী, গরু, ছাগল, শাক-শব্জি ইত্যাদি আরো দ্রুত গতিতে উৎপাদন করে খাদ্য সমস্যা চিরতরে নির্মূল করা যায়। আপাততঃ মার্কিন যুক্তরাস্ট্র থেকে বাংলাদেশ আসতে বিমান পথে দুই দিন সময় লাগে। মার্কিনী প্রকৌশলীরা ভাবছে কি করে এই বিমানযাত্রা আট/দশ ঘন্টায় সারা যায়। ঘটনাক্রমে বলে রাখি, প্রায় দশ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সেনাবাহিনীর হাতে এমন একটি বিমান এসেছে যা মাত্র তিন ঘন্টায় পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে। আপনারা নিশ্চয় এর মানে বুঝতে পারছেন। পৃথিবীর পরিধির অর্ধেক প্রায় বারো হাজার মাইল। অর্থাৎ এই বিমান ঘন্টায় চার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে!

মার্কিনী শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক তফাৎটি এতক্ষণে নিশ্চয় আপনাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা বেতনের প্রতিশ্রুতি ও উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য তৈরীর আবশ্যকতা মার্কিনী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সামনের দিকে পরিচালিত করে। তাই মার্কিনী ছাত্রকে মৌলিক বিষয়গুলি শিখতেই হয়। আমার জানামতে, মার্কিনী অধ্যাপক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কেবল ছাত্রের মৌলিক জ্ঞানেরই যাচাই করার চেষ্টা করেন। যেমন, ধরা যাক কোন একটি অধ্যায়ের শেষে চল্লিশটি অংক আছে এবং মার্কিনী অধ্যাপক এই অধ্যায় থেকে পরীক্ষার জন্য একটি অংক বাছাই করবেন। ধরা যাক চল্লিশটি অংক সহজ থেকে কঠিন এই ক্রম অনুসারে সাজানো আছে। মার্কনী অধ্যাপক এমন একটি অংক বাছাই করবেন যার কঠিনতার স্তর সাধারণতঃ এক থেকে দশ নম্বর অংকের সমতুল্য হবে। আমাদের দেশে প্রশ্ন করা হয় তিরিশ থেকে চল্লিশ নম্বর অংকের কঠিনতার স্তরে। বেশ বোঝা যায়, আমাদের দেশে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটা দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। কে কাকে হারাতে পারে। ছাত্রের লক্ষ্য চোথা মেরে কোন রকমে ডিগ্রীটা পাওয়া এবং শিক্ষকের লক্ষ্য চোথা মারার কার্যকারিতা নস্যাৎ করা।

এই প্রবণতার কারণ খুব স্পষ্ট। আমাদের ছাত্রদের সামনে মার্কিনী ছাত্রের মতো তেমন কোন চ্যালেঞ্জপূর্ণ কাজ নেই এবং লক্ষ টাকা মাসিক বেতনের অঙ্গীকার নেই। ফলে মার্কিনী ছাত্র বস্তুনিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে, আমাদের গ্রাজুয়েটেরা কেতাব-সর্বস্ব হয় এবং ফলস্বরূপ হীনমন্যতায় ভোগে। এই পরিস্থিতি থেকে উঠে আসার একমাত্র উপায় হচ্ছে, আপনাদের বেতন শিল্পোন্নত দেশের প্রকৌশলীদের বেতনের সমতুল্য করে তোলা এবং দ্রুত স্বদেশে উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য উৎপাদনের কাজ শুরু করা।

এই সূত্রে আপনাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রস্তাবের কথা বলি। প্রস্তাবটি এই রকম : যে-কোন দেশের সামাজিক অগ্রগতি সে দেশে উৎপাদিত পণ্যে নিহিত শ্রমের আধুনিকতা থেকে পরিমাপ করা সম্ভব। অর্থাৎ কোন দেশে কি ধরণের পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে তা দেখলে সে দেশের সামাজিক অগ্রগতির মাত্রাটি ধরে ফেলা যাবে। এই ফর্মূলা দিয়ে এখন সহজেই যে-কোন দেশের সমাজিক উন্নতির ধাপ যাচাই করা সম্ভব। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন, আমি কেবল অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলছি না, বরং গোটা সমাজের অগ্রগতি মাপার কথা বলছি।

উচ্চতর প্রযুক্তির সাথে সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক কোথায় সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়। প্রথমে এর দার্শনিক তাৎপর্যটি সম্পর্কে বলি। যে-কোন প্রকল্পের জন্য বহুস্তর-বিশিষ্ট ও বহুমুখী জটিল পরিকল্পনা সূক্ষ্ম ও সফলভাবে তৈরী করার নামই উচ্চতর প্রযুক্তি। আদিম মানুষ এক সময় ছিল শিকারী। এক সময় ছিল সংগ্রহকারী। এ সব কাজের জন্য পরিকল্পনা ছিল সরল। আমাদের দেশ এখন প্রধানতঃ লাঙ্গল ও গরুর গাড়ীর প্রযুক্তির অধীন। লাঙ্গল ও গরুর গাড়ী নির্মাণের প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা সরল। এরপরের ধাপ হলো : কৃষির জন্য ট্রাকটর, বানানো, বিদে

দেবার যন্ত্র বানানো, সেচের জন্য আধুনিক ব্যবস্থা নির্মাণ, ফসল তোলার যন্ত্র বানানো, ফসল ও খাদ্য পরিবহনযোগ্য ট্রাক বানানো। সাথে আধুনিক রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, আধুনিক টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ, ইত্যাদি।

উদাহরণস্বরূপ গাড়ী নির্মাণ করার কথা ধরুন। অসংখ্য ছোট বড় টুকরো মিলে একটি গাড়ী তৈরী হয়। গাড়ীতে ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার ও পিস্টনের দরকার। ঘর্ষণে ঘর্ষণে আগুন ধরে যাবে, তাই ঠাণ্ডা করার জন্য ফ্যানের বাতাস ও শীতলকরণ তরল পদার্থের ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়া চাকা তৈরীর জন্য রাবার প্রক্রিয়াজাত করে টায়ার বানানো। স্টার্ট দেবার জন্য বৈদ্যুতিক যোগাযোগের ব্যবস্থা করা। এই রকম নানা ধরণের ছোট বড় অংশ একত্রিত করলে তবে গাড়ী তৈরী হবে। এর জন্য ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন। প্রতিটি টুকরো এমনভাবে বানাতে হবে যাতে এগুলি পরস্পরের সাথে ফিট করে। প্রতিটি অংশের কাজ অন্যান্য অংশের কাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। গাড়ী চালানোর সময় এর উপর কি ধরণের বল কাজ করবে এবং তার ফল কি হতে পারে, ইত্যাদি বহু টুকরো টুকরো বিষয় ও অংশ আদতে একটি সঙ্গতিপূর্ণ গোটা পরিকল্পনার মাধ্যমে সমন্বয় করা লাগে।

অল্প একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, মহাশূন্যগামী একটি রকেট বানাতে আরো জটিল পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়বে। সহজেই বোঝা যায়, গাড়ী অথবা রকেটের মতো যন্ত্র বানাতে নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে, যেমন : যন্ত্র কৌশল বিদ্যা, রসায়ন, তড়িৎ কৌশল, ইত্যাদি। বাংলাদেশে গাড়ী, নানা প্রকার রসায়নিক পদার্থ, ফ্রিজ, অন্যান্য কৃষি-সরঞ্জাম, ইত্যাদি উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য তৈরীর শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যথেষ্ঠ সংখ্যায় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করতে বাধ্য হবে।

আগে যে আভ্যন্তরীণ বাজার উন্নয়ন অর্থাৎ শিল্পোন্নত বিশ্বের সমতূল্য বেতন প্রদানের কথা বলেছি সেই কাজটি সমাপন করতে পারলে এই বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে কর্মরত রাখাও সম্ভব হবে। আপনারা নিশ্চয় একমত হবেন যে, এই বিশেষজ্ঞদের কাজ হাতুড়ে বিশেষজ্ঞ দিয়ে সম্পন্ন করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, গরুর গাড়ী ও লাঙ্গল বানানোর জ্ঞান দিয়ে বৈদ্যুতিক জেনারেটর বিশ্লেষণ ও ডিজাইন করা সম্ভব নয়। এর জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব সহ আরো অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং বিশেষজ্ঞ বলতে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ, অর্থাৎ ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পি-এইচ-ডি ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদের বুঝাচ্ছি।

বিশেষজ্ঞ কেবল বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রেই প্রসারলাভ করবে তা নয়। যে সব কোম্পানী উচ্চ প্রযুক্তির পণ্য বানায়, সেই সব কোম্পানী আকারে অনেক বড় হয়। এইসব কোম্পানী অনেক সংখ্যায় কর্মী নিয়োগ করে। বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী ছাড়াও এরা বড় বড় ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক, ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, বাজার বিশেষজ্ঞ, সাধারণ কর্মী, ইত্যাদি নিয়োগ করে। এছাড়া এই কোম্পানীগুলি একা একা সব প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করতে পারে না। ফলে এই মূল কোম্পানীগুলি ঘিরে আরো অনেক উচ্চ প্রযুক্তির কোম্পানী গড়ে ওঠে। তারাও বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে থাকে। ফলে গোটা সমাজে জটিল চিন্তা ও পরিকল্পনায় পারদর্শী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

এই সব কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক, সাধারণ কর্মী - এঁরা কি কি কাজ করে থাকেন তা আপনাদের অজানা নয়। অর্থনীতিবিদ, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, বাজার বিশেষজ্ঞ এঁরা কি কি করেন তা একটু ভেবে দেখা যাক। আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য কেবল বানালেই যথেষ্ট হয় না। সেগুলি বিক্রি করাও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই বিশেষজ্ঞরা সমাজে মানুষের আচার-ব্যবহার, রুচি, মানসিক প্রফাইল, আয়ের স্তর, ইত্যাদি বিষয়ে টো টো জ্ঞান রাখেন। ফলে কোন্ কোন্ স্তরের মানুষের কাছে কি কি পণ্য বিক্রি করা যায়

তা তাঁরা হিসেব করে বের করে ফেলতে পারেন। এছাড়া এঁরা কেবল অস্তিত্বশীল চাহিদার পরিমাপই করেন না। কি করে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা যায় তাও তাঁরা ভেবে বের করেন। ‘সে’, এস-এ-ওয়াই, ‘সে’ নামের একজন পুরোনো অর্থনীতিবিদ চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, পায়ের মাপে জুতো বানানো নয়, বরং জুতোর মাপে পা বানানোর ব্যাপারটিও গুরুত্ববাহী। সমাজের কোন্ স্তরের কত অংশ মানুষ নতুন কোন্ পণ্য কিনবে তা এই বিশেষজ্ঞরা ঠিক ধরে ফেলতে পারেন এবং সময় মতো নতুন পণ্য বাজারজাত করার পরিকল্পনা করেন।

এছাড়া বাংলাদেশে তৈরী পণ্য কেবল বাংলদেশের মধ্যে বিক্রি করলে এইসব কোম্পানীর পক্ষে টিকে থাকা মুস্কিল। বড় বড় অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, এই ধরণের কোম্পানী দ্বারা গঠিত অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া আদৌ অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। সুতরাং বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা কেবলমাত্র বাংলাদেশ ও বাংলাদেশী মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেই ক্ষান্ত থাকতে পারেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্থান-পতন এবং এসব দেশের মানুষের কৃষ্টি, রুচি ও মন-মানসিকতা সম্পর্কেও বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা জ্ঞানলাভ করতে বাধ্য থাকবেন। এর ফলে বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাস্ট্র বিশেষজ্ঞ, সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ, এশিয়া বিশেষজ্ঞ, আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ, ইউরোপ বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি তৈরী হতে থাকবে।

স্বদেশে উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য উৎপাদনের সাথে সামাজিক অগ্রগতির যোগসূত্রটি কোথায় তা আপনারা আশা করি এতক্ষণে বুঝে নিয়েছেন। স্বদেশে পণ্য তৈরী ও বিক্রি করতে গিয়ে সমাজে যে জ্ঞান ও জটিল পরিকল্পনা করার ক্ষমতা তৈরী হলো তা সমাজকে বিরাট এক ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সমাজ নিজের সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে উঠবে। দেশের সরকার সমাজ সম্পর্কিত এই জ্ঞান ও চেতনা সমাজের সার্বিক মঙ্গলের কাজে ব্যবহার করতে পারে। তাই পুরোনো কথাটা আরেকবার ঝালাই করা যায়। কথাটা এই রকম : সমাজের সার্বিক কল্যাণের খাতিরে বাংলাদেশে উচ্চতর প্রযুক্তির পণ্য উৎপাদন শিল্প গড়ে তোলার উৎসাহ প্রদান করা উচিৎ। আমি জানি, আমাদের দেশের প্রকৌশলীরা এই সিদ্ধান্তের সাথে সম্পূর্ণ একমত হবেন।

এই মতামতের সাথে আরো অনেক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে যা আজ আর আপনাদের বলছি না। বরং বাকী সময়টা আপনাদের সাথে গল্প করে কাটিয়ে দিতে চাই। শেষ করার আগে আরেকটি কথা বলে নেই। আপনাদের অনেকের মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জাগছে, আমি এতক্ষণ ধরে যে ধারণাটির কথা বললাম সেটি কি করে বাস্তবায়িত করা যায়। বি-ডি-আই অবিরত সে বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। বি-ডি-আই এ ব্যাপারে বাংলাদেশী প্রকৌশলী সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে চায়। বিশেষতঃ বি-ডি-আই বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌সটিটিউট, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল কলেজগুলির সাথে একটি স্থায়ী ভিত্তিতে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চায়। ফলে ভবিষ্যতে যৌথভাবে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্‌সটিটিউট-এর মাসিক পত্রিকা ‘‘ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ’’-এ প্রকৌশলীদের ভাল-মন্দ, কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করার সময় আজকের আলোচিত বিষয় নিয়েও লেখালেখি করা যেতে পারে। এখন বলুন আপনাদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা।

(সমাপ্ত)